যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা জরুরি

কলা বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা ফিরিয়ে আনার দাবিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই আন্দোলন রবিবারও অব্যাহত। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা ফিরিয়ে আনার জন্য সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন।

বলা দরকার, কলা বিভাগে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার প্রথা দীর্ঘদিনের। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বরাবরই ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস ইত্যাদি বিভাগে সারা দেশের মেধাবী পড়ুয়ারা আসেন। ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগে শিক্ষার উৎকর্ষ এবং মান প্রশ্নাতীত। এটা নিঃসন্দেহে বাংলায় গৌরব। এসব সত্ত্বেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন পুরনো পদ্ধতি তুলে দিয়ে নতুন পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে তা রহস্যাবৃত। কোনও চাপের মুখে এটা হয়ে থাকলে তা দুর্ভাগ্যজনক। এভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরব প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই করুণ দশা যেন না হয়। এমন হলে আগামী প্রজন্ম ক্ষমা করবে না। যাদবপুরের বর্তমান উপাচার্য সুরঞ্জন দাস একজন শিক্ষাব্রতী। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সুচারুভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন এবং প্রশাসন চালাচ্ছেন। তাঁর মতো একজন কৃতী অধ্যাপক এই সমস্যার সমাধান করে যাদবপুরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবেন, এটাই প্রত্যাশা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্যামাধন কী সবাই পায়,
অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়।।
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়,
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামাযদি ফিরে চায়।।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণে কমলা কান্ত তবু সে চরণ চায়।।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ ভাবাপ্তি হইয়া রহিয়াছেন। গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা সম্মুখে আছেন। কিছু দিন পূর্বে স্টার থিয়েটারে গিরিশ অনেক কথা বলিয়াছিলেন; এখন শান্ত ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)— তোমার এ বেশ ভাল; শান্ত ভাব, মাকে তাই বলেছিলেন, মা ওকে শান্ত করে দাও, যা তা আমায় না বলে।

গিরিশ (মাষ্টারের প্রতি)--- আমার জিভ কে যেন চেপে ধরেছে। আমায় কথা কইতে দিচ্ছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ অর্ন্তমুখ। বাহিরের ব্যাক্তি, বস্তু ক্রমে ক্রমে সব ভুলে যাচ্ছেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনকে নাবাচ্ছেন। ভক্তদের আবার দেখিতেছেন। (মাষ্টার দৃষ্টে) এরা সব সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যায়—তা যায় তো যায়; মা সব জানে।

(প্রতিবেশী ছোকরার প্রতি)—"কি গো! তোমার কি বোধ হয়? মানুষের কি কর্তব্য?"

সকল চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নারায়ণের প্রতি)—তুই পাশ করিবিনি? ওরে পাপমুক্ত শিব, পাশবদ্ধ জীব।

ঠাকুর এখন ভাবাবস্থায় আছেন। কাছে গ্লাস ভরা জল ছিল, পান করিলেন। তিনি আপনা আপনি বলিতেছেন, কইভাবে তো জল খেয়ে ফেললুম!

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত অতুল—ব্যাকুলতা

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর গিরিশের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলের সহিত কথা কহিতেছেন।

অতুল ভক্তসঙ্গে সম্মুখেই বসিয়া আছেন। একজন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন। অতুল হাইকোর্ট-এর উকিল।

দিনপঞ্জিকা

২৫ আষাঢ়, ভাঃ ১৯ আষাঢ়, **১০ জুলাই**, ২৫ আহার, সংবৎ ১২ আষাঢ় বদি, ২৫ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩। **মঙ্গলবার**, দ্বাদশী দিবা ঘ ৩।৪১ মিঃ। রোহিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৩৩ মিঃ। গন্ডযোগ রাত্রি ঘ ৭।১২ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ৩।৪১ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ২।৪০ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**--বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ঘ ১।৩৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। **মৃতে**– দ্বিপাদদোষ দিবা ঘ ৩।৪১ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**– নৈর্ঋতে, দিবা ঘ ৩।৪১ গতে দক্ষিণে। **বারবেলাদি** ঘ ৬।৪২ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ১।২৩ ৩।৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।৪৩ গতে ৯।৩ মধ্যে। **যাত্রা**-- মধ্যম উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। দিবা ঘ ১২।৫ গতে নৈঋর্তে অগ্নিকোণেও নিষেধ। দিবা ঘ ৩।৪১ গতে মাত্র উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১।৩৩ গতে যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-- গর্ভাধান। **বিবাহ–রাত্রি ঘ ১।৩৩ গতে শেষরাত্রি ঘ ৫।৩ মধ্যে বৃষ ও মিথুন লগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ**। **বিবিধ**– দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ব্বাহ্ণ ঘ ৯।২৯ মধ্যে একাদশীর পারণ। **অমৃতযোগ**—- দিবা ঘ ৭।৪৩ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৫ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—-দিবা ঘ ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ও ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৫ আষাঢ়, ভাঃ ১৯ আষাঢ়, ১০ জুলাই, ২৫ শওয়াল, ২৫ আহাব, উঃ ৫।০১, অঃ ৬।২১, মঙলবার, দ্বাদশী দি ঘ ৩।৪০, সেহ্‌রী শেষ ৩।২৭ ইফ্‌তার শেষ ৬।২৯।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে মাতৃধাম জয়রামবাটী

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

পর্ব - ৪

সবদিক বিবেচনা করে আমরা সিদ্ধান্তের ভার পাঠকবর্গের হাতে ছেড়ে দিলাম— স্বামী বিবেকানন্দ কামারপুকুর-জয়রামবাটী গিয়েছিলেন কিনা? তাছাড়া স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ— এই তিন সন্ন্যাসীর জয়রামবাটী-কামারপুকুর না আসার রহস্য এখনও আমাদের কাছে রহস্যই রয়ে গেছে।[১৩]

৪। মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠালগ্ন

যে কোন প্রতিষ্ঠানের বা মন্দির নির্মাণের জন্মলগ্নে থাকে তার কৃচ্ছসাধনের ইতিহাস। আর এই প্রতিষ্ঠানের গঠন, তার ধীরে ধীরে হয়ে ওঠার মধ্যে কত মানুষের কঠোর শ্রম, ধৈর্য, অধ্যাবসায় এবং থাকে আত্মোৎসর্গ। জয়রামবাটী শ্রীমাকে অঙ্কে ধারণ করে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠে পরিণত হয়েছে। শ্রীমায়ের জন্মস্থানটি বেলুড়মঠ কর্তৃপক্ষের হাতে দেবার ব্যবস্থা করে যান শ্রীমা স্বয়ং। শ্রীমায়ের আবির্ভাবস্থলে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই শ্রীমা বাগবাজারের বাড়িতে (মায়ের বাড়ি) মহাপ্রয়াণ করেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর, বুধবার শ্রীমায়ের জন্মতিথিতে স্বামী সারদানন্দ মাতৃমন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল ১৩৩০ সালের ৫ বৈশাখ) বৃহস্পতিবার অক্ষয়তৃতীয়ার শুভক্ষণে স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং মাতৃমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। প্রথমে শ্রীমায়ের প্রিয়সন্তান ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (কাইজার) প্রমাণ আকার শ্রীমায়ের একটি বড় তৈলচিত্র বিলাতের এক সাহেবশিল্পীকে দিয়ে আঁকান। শ্রীমা ঐ তৈলচিত্রটিকে ফুল-চন্দন দিয়ে স্বয়ং পূজা করেন। স্বামী সারদানন্দ ঐ তৈলচিত্র শ্রীমন্দির বিগ্রহরূপে শুভ অক্ষয়তৃতীয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন[১৪] এবং ত্রিশ বছর ধরে ঐ চিত্রে শ্রীমায়ের নিত্যপূজা হয়।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী লিখেছেন, 'মন্দিরের ভিতর তখন প্রতিষ্ঠা-পূজা পুরামাত্রায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের সকল দ্বার উন্মুক্ত। মা জাগ্রতা, বরাভয়-মূর্তিতে পদ্মাসনে উপবিষ্টা। যেন অজস্র ধারায় স্নেহসুধা বর্ষিত হইতেছে তাঁহার করুণামাখা চাহুনিতে। সেই স্নেহধারায় আপ্লুত হইয়া অসংখ্য ভক্তহৃদয় মুহুর্মুহু লুটাইয়া পড়িতেছে মাতৃচরণে। ... ধূপ-ধুনার পুণ্যধূমে বায়ুমণ্ডল আমোদিত। কালো কষ্টিপাথরের বেদীতে লাল আভাযুক্ত পদ্মের উপর পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন কল্যাণময়ী মা।... অসংখ্য ভাব-স্তব্ধ দর্শক ও ধ্যানজপরত ভক্ত-পরিবেষ্টিত মন্দিরের মধ্যে মায়ের পূজা চলিতে লাগিল।... এই অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীতে এ যুগের মহাশক্তির জাগ্রত পীঠ প্রতিষ্ঠিত হইল।[১৫]

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকারের তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে নাটমন্দির আর তার ওপরের নহবতখানা তৈরি হয়। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন মার্টিন বার্ন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার অফিসার। নাটমন্দির নির্মাণের জন্য কুমারকৃষ্ণ নন্দী প্রমুখ অর্থ সাহায্য করেন। মাতৃমন্দিরের সপ্তদ্বার, ছয় গবাক্ষ। ভিতরকার শয়নগৃহের দরজাসহ নবদ্বার। বৌদ্ধস্তূপ ও মুসলমান গম্বুজ—এই দুইরীতির সংমিশ্রণ।

গম্বুজ সমেত মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট। দৈর্ঘ্য ৩৩ ফুট × ৬ ফুট, প্রস্থে ১৯ ফুট × ৬ ফুট। গর্ভমন্দিরের চূড়ায় রয়েছে 'মা' নামাঙ্কিত ধাতব পতাকা। মাতৃমন্দিরের পুরানো নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, মাতৃমন্দিরের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী পরমেশ্বরানন্দের (কিশোরী মহারাজ) অনুমেদান অনুসারে স্বামী ঋতানন্দ (গগন মহারাজ) কাশীতে শ্রীমায়ের মর্মর মূর্তি তৈরি করান। তিনি তখন কাশী সেবাশ্রমে সেবারত ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মূর্তির নির্মাণকার্য শুরু করেন কাশীর গোধুলিয়াস্থিত 'এম. জি. প্রসাদ এণ্ড সন্স' নামক সংস্থা— যার মালিক ছিলেন মহাদেও প্রসাদ বিশ্বকর্মা। মাতৃমূর্তি ও তৎসহ রক্তপদ্ম তাঁরই তৈরি। মূর্তির জন্য মোট খরচ পড়ে ৩২০০ টাকা। মূর্তি নির্মাণে সাহায্য করেন অজিত হাজরা।[১৬]

শ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল (১৩৬০ সালের ২৫ চৈত্র) বৃহস্পতিবার, বাসন্তী সপ্তমীতিথিতে সেই কালোপাথরের বেদির উপর শ্রীমায়ের মর্মরমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ। সেদিন রাসে মাতৃমন্দিরে সারারাত্রিব্যাপী দশ মহাবিদ্যার পূজার আয়োজন হয় এবং তিনদিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসব সুসম্পন্ন হয়। পরদিন অষ্টমীতিথিতে নাটমন্দিরে অন্নপূর্ণা পূজাও করা হয়। শ্রীমায়ের পূতদেহাস্থি মন্দিরাভ্যন্তরে স্থাপিত হয়। নিত্য পূজা ও ভোগারাগাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ লিখেছেন, "১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীমায়ের নির্দেশে নবাসন আশ্রমে (বর্তমানে অবলুপ্ত) স্বামী জ্ঞানানন্দ (জ্ঞান মহারাজ) যোগদান করেন। পরে শরৎ মহারাজ জ্ঞানানন্দকে জয়রামবাটীর প্রথম মোহন্ত হিসাবে বসিয়ে দেন। বলেন, 'তুই এখানে থাক'। মা (উদ্বোধনে) চলে যাচ্ছেন, বাড়িটার দেখাশোনা কে করবে? তুই ঠাকুরের পূজা করবি আর হোমিওপ্যাথি বই পড়বি। জপধ্যান করবি। শ্রীমা উদ্বোধনে যাবার সময় জ্ঞানকে একটি মন্ত্র দিয়ে ফেললেন, 'দ্যাখো বাবা জ্ঞান, বেড়ালগুলোকে মেরো না'। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধীনে জয়রামবাটী মাতৃমন্দির মঠটি স্বামী সারদানন্দই বেলুড় মঠের ট্রাস্টিবোর্ডকে অর্পন করেছিলেন। মাতৃমন্দিরের প্রশাখা কেন্দ্র হয় শ্রীমায়ের বৈঠকখানা 'কোয়ালপাড়া আশ্রম'।

মাতৃমন্দিরের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ হিসাবে শ্রীমায়ের সেবক ও মন্ত্রশিষ্য স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী মহারাজ) যোগদান করেন। তিনি মাতৃমন্দিরের সূত্রপাত থেকে একটানা ৬৫ বছর সেবকরূপে জয়রামবাটীতে বাস করার মহাসৌভাগ্য লাভে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। শ্রীমায়ের সেবক ও মন্ত্রশিষ্য স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ (রামময় মহারাজ) ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় অধ্যক্ষ হিসাবে থাকার পর জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরেই অবসর জীবন কাটিয়েছিলেন। মাতৃময় ছিল রামময়ের জীবন। অবসর জীবনে তিনি ভক্তদের কাছে শুধু শ্রীমায়ের জীবনাদর্শই তুলে ধরেছেন। স্বামী প্রেমরূপানন্দ (হরিপদ মহারাজ) মাতৃ মন্দিরের চতুর্থ অধ্যক্ষ হিসাবে ১৯৭৯ থেকে জীবনের শেষ দিন ১৯৯১ পর্যন্ত সেবারত ছিলেন। এরপর পঞ্চম অধ্যক্ষ হিসাবে স্বামী অমেয়ানন্দ দীর্ঘদিন জয়রামবাটীতে থাকার পর বাংলাদেশে যোগদান করেন। বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোর্তিময়ানন্দজী মহারাজ দক্ষতার সঙ্গে সেবাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে জয়রামবাটীতে 'মাতৃমন্দির' প্রতিষ্ঠালগ্নের প্রথম থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। জাতির সেবার এই অধিকার পেয়ে মাতৃমন্দির আজ গৌরবান্বিত। স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন, "তাঁহার (শ্রীমায়ের) জন্মস্থলের উপর অবস্থিত শুভ্র ইষ্টক মন্দিরের শ্বেতচূড়া এবং তদুপোরি 'মা' নামাঙ্কিত। ধাতু পতাকা দূরদূরান্তের পথিক বর্গকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে এবং দেশ-বিদেশের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। লোক চলাচলের অপেক্ষাকৃত সুবিধা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্র স্থাপন এবং ওই কেন্দ্রকে অবলম্বনপূর্বক বিবিধ সেবানুষ্ঠানের ফলে জনসামাজের দৃষ্টি এই অতি পবিত্র পীঠের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেরও উন্নতি হইতেছে। শ্রীজগদম্বার ইহা এতই অপূর্ব মহিমা যে, তাঁহার পাদপদ্মস্পর্শে নগন্য জয়রামবাটী আজ পুন্যতীর্থে পরিনত হইয়া নিজ গৌরব সর্বত্র ঘোষণা করিতেছে। শ্রীমা এই ভূমির ধূলি স্বয়ং একদিন মন্ত্রকে ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।[১৮]

ক্রমশ

ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করলেই জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

শেষ পর্ব

মূর্তি পূজা অত্যন্ত নিম্নস্তরের সাধনা। ভক্ত কেবল নিজ সংস্কার বশে দেবমূর্তিকে ভক্তি করে থাকেন নিজের মনের বিশ্বাস, শান্তি ও তৃপ্তির জন্য। যেমন পিতামাতা ও গুরজনদের শ্রদ্ধা করে থাকেন। এসব কিছুই কিছু নয়। মানুষ নিজেই পাপের শাস্তিদাতা। এর জন্য ঈশ্বর দায়ী নয়। সে নিজেই দায়ী। কারণ কর্মফলরূপী ঈশ্বর আত্মা-বিভু-ঈশ্বর কারও পাপ-পূণ্য গ্রহণ করেন না। তিনি 'ইহা কর' বলে আদেশ করেন না। মানুষ নিজের ইচ্ছা মত স্বভাব অনুসারে ধর্ম-কর্ম করে থাকে মাত্র। *(গীতা ৫/১৪-১৫)*

হিন্দুশাস্ত্রে বিধান উপবাস, সংযম সুস্থ জীবনের জন্য বিশেষ হিতকর। অর্থাৎ শরীর সাধনাই যে আসল ধর্মসাধনা এই আপ্তবাক্যটি মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে হয়। সাত্ত্বিক পুজোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে শরীর সুস্থ রেখে অন্তর্হিত শক্তিকে জাগ্রত করা। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা। ভাবাকুতির মাধ্যমে স্বর্গের দেবতাকে বুকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রচলিত মাধ্যমে ব্রতগুলির মাধ্যমে বাঙালির সচল সজীব প্রাণবন্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। লোকশিক্ষার বাহনস্বরূপ এইসব বিভিন্ন পুজোপার্বণ ব্রতগুলি নিয়েই আমাদের দিন কাটাতে হবে।

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি হচ্ছেন স্বর্গের বৈদিক দেবতা। বৈদিক যাগ-যজ্ঞের মাধমে এঁদের আরাধনা করা হয়। এঁরা কেউ ঈশ্বর নন। এঁরা ঈশ্বরের বিভূতি মাত্র। তাই স্বর্গের দেবতাদের দর্শনে মুক্তিলাভ হয় না। পুনর্জন্ম হয়। স্বর্গের দেবতাদের আরাধনায় স্বর্গলাভ হতে পারে। কিন্তু মোক্ষলাভ হয় না। কিন্তু এঁদের ঈশ্বর ভেবে আরাধনা করলে ঈশ্বরের কৃপায় মুক্তি হতে পারেন।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হচ্ছেন পুরাণ ও তন্ত্রের মতে বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি। ঈশ্বরের শক্তিতেই শক্তিমান হয়ে স্বর্গের দেবতারা কাজ করেন। নচেৎ তাঁদের নিজস্ব কোনও শক্তি নেই। গ্রহগুলিও ওই ঈশ্বরের অধীনে থেকে তাঁর নির্দেশে কাজ করে থাকেন। সেইজন্য কেবল মাত্র ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করলেই সব দেবতা ও গ্রহগণ সন্তুষ্ট হন। তস্মিংতুষ্টেং। প্রথম শক্তি উমারূপে দেবতাদের দর্শন দান করে তাঁদের বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর শক্তিতেই দেবতারা শক্তিমান হয়ে কাজ করে থাকেন।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথে ঠনঠনিয়ার কালীবাড়িতে ডাব আর চিনি মানত করে যেতেন। শুনলে অবাক লাগে, ব্রাহ্মধর্মালম্বী কেশবচন্দ্র সেনের অসুখ ভালো করে দেওয়ার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করতেন তিনি।

কলিতে তন্ত্র ও পুরাণ মতে সাধন করতে হবে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ- *(কথামৃত ৫/৪৯,৩/২০১ পৃঃ। উপদেশ ৪৮৩ ও মহানির্বাণ তন্ত্র-৯২/১৪-১৫)*।

স্বপ্নে আদেশ পেয়ে পূজা করলে তা স্থায়ী হয়। অহং ব্রহ্মাস্মি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। নিজেকে ব্রহ্ম ভাবাপন্ন না করলে শুধু পুজো-জপে কী হবে? সেজন্য শিবতন্ত্রে সোহং অর্থাৎ সাধকই ঈশ্বর, এই জ্ঞানের উপর জোর দিয়েছেন।

মনুষ্য জীবনের বড় ধর্ম হল তার কর্ম, কর্মের চেয়ে দরকারি কিছু নেই। কর্মই ধর্ম ও মহাসাধন যা নির্বাণ বা মুক্তির একমাত্র উপায়-*মহর্ষি বাল্মীকি (যোগাবিষ্ট রামায়ণ)*। কর্মের ঢাক আপনি বাজে। করুণাঘন ভগবান গৌতম বুদ্ধ এক মহান ধর্ম সংস্কারক হিসাবে বলেছেন, সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব থেকেই সকল দুঃখ-যন্ত্রণার উৎপত্তি। মানুষের মহাসম্বল আত্মবিশ্বাস ও কর্মের উপর জোর দিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ সেই শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন মানুষকে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বধামে ফিরে যাওয়ার আগে অর্থাৎ দেহত্যাগের পূর্বে ধর্মের হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে বলেন—তোমাদের 'চৈতন্য হোক' অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হোক। আত্মজ্ঞান লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র সাধনা। কেবলমাত্র আত্মাকে বুঝতে পারলেই মুক্তি হয়ে থাকে। ইহাই সনাতন সত্যধর্ম। সত্য কথ্য, কলির তপস্যা। সত্য, ঋত, ব্রহ্ম, শাশ্বত, কর্ম, একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। মিথ্যাবাদীর ধর্মলাভ হয় না। মিথ্যাবাদীকে শেষ জীবনে চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়। তার অপমৃত্যু হয় কিংবা উন্মাদ হয়ে যায়-ব্রহ্মা-(মহাঃদ্রণ-৬৪)। মিথ্যার চেয়ে মহাপাপ আর কিছু নেই-(মহা নির্বাণ তন্ত্র-৪/৭০/৭৫)।

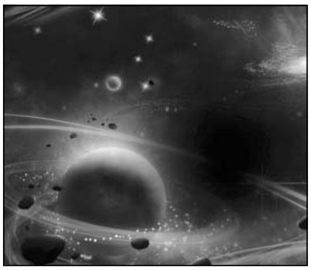

চাই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, জীবাত্মার জ্ঞান। জ্ঞানসাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। দেহে আত্মবুদ্ধি না গেলে একদম জ্ঞানই হবে না। জ্ঞান না হলে ভক্তি হয় না। চাই জ্ঞানমিশ্র ভক্তি; নচেৎ ওসব ঠুনকো ভক্তি। ভাবাবেগ হচ্ছে আত্মসম্মোহন। প্রত্যক্ষ দর্শন হচ্ছে জ্ঞান। আর অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির অনুভূতি। এই অনুভূতির তারতম্য হতে পারে, জ্ঞান হচ্ছে প্রজ্ঞা। নচেৎ সব ভ্রান্তি, অবিদ্যামাত্র। আত্মজ্ঞান না হইলে মানুষ চিরশান্তি লাভ করতে পারে না- (গীতা - ৮/১৬)।

ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে থেকে আপন মায়াশক্তির দ্বারা কলের পুতুলের ন্যায় জীবকে পরিচালিত করছেন - (গীতা ১৮/৬১)। অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সর্বদা সব মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে তাদের পরিচালিত করছেন। তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কী-যাহা হইতে এই জগতের জন্মাদি-উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সাধিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনি অবশ্যই মুক্তিলাভ করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বপ্রকার সংসর্গ ত্যাগ করেন। জীবাত্মাই ঈশ্বর। জীবাত্মাই শুভ্র, শুদ্ধ-ইনিই ব্রহ্ম। এছাড়া অন্য কোনও গুহ্য ব্রহ্ম নেই। ব্রহ্মই ঈশ্বর। একমাত্র ব্রহ্মই সৎ ও উচ্ছিষ্ট হয়নি। সর্বং খ্বলিদং ব্রহ্ম! ব্রহ্ম সত্য, জগত সত্য-(ছান্দোগ্য উঃ) ইনিই মানুষের ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। ইনিই ব্রহ্মের শক্তি তথা আদ্যাশক্তি ভক্তের আকাঙ্খিত দেবদেবী ও গুরুর রূপ ধরে চিন্ময় মূর্তিতে দর্শন দিয়ে ভক্তকে কৃপা করেন। এই চিন্ময় স্বপ্রকাশ আদিত্যবর্ণ পুরুষকেই জানতে হবে। এছাড়া অমৃতত্ত্ব লাভের অন্য পথ নেই। এই হল চিরকালীন সনাতন ধর্ম। জগৎগুরু ব্যাসদেব বলেছেন, নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কিছুই লাভ করতে পারে না (মভাঃ, শান্তি অ ২৫)। আবার যে যুগের যিনি অবতার, তাঁর হাতে থাকে জীবের মুক্তির চাবি। যুগাবতারই প্রকৃত সদ্‌গুরু। সেজন্য তাঁর উপদেশ অনুসারে চলতে হয়। নচেৎ, বেপথু হলে মুক্তি হয় না। কলিতে অবতার জীবহৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকেন। সদ্‌গুরু লাভ হলে শিষ্যের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। তখন গুরুই সব দেখেন। শিষ্যের অকাল মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু অপমৃত্যু হয় না। সদ্‌গুরু শিষ্যকে মুক্ত করে দেন।

সম্পাদক সমীপেষু

আনন্দনিকেতন ছবির জন্য গুলজার গান লিখেছিলেন

একটা বাংলা ছবিতে যদি কেউ বাংলা গানের কথা লেখেন তাকে আমরা বলি গীতিকার বলি। এমন একজন গীতিকারের নাম সম্পূরণ সিং। যিনি ভারতীয় সিনেমায় গুলজার নামেই খ্যাত হয়েছিলেন। বন্দি ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তারপর থেকে বহু গানের রচনা করে গেছেন, যা আজও কালজয়ী গান হিসাবে রয়েছে। মনে পড়ে যায় 'বিলম্বিত লয়' ছবিতে একটি গান ছিল, যে গানেতে কন্ঠদান করেছিলেন মান্না দে ও আরতী মুখোপাধ্যায়। এই গানটি হিন্দিতে গাওয়া হয়েছিল। এই গানের রচনা করেছিলেন গুলজারসাহেব। এছাড়া আনন্দ ছবিতেও তিনি গান লিখেছিলেন। 'জানে কেয়া সোচ কর' এই গানটা তিনি কিনারা ছবির জন্য লিখেছিলেন, 'ও মাঝিরে' এই গানটা তিনি খুশবু ছবির জন্য লিখেছিলেন। 'মুসাফির হু ইয়ারো' পরিচয় ছবিতে এইগান পেয়েছি। রত্নদীপ ছবিতে কভী কভী স্বপ্না লাগত্যা হ্যায়। এই গানেও তিনি। আমরা আঁধী ছবিতেও গুলজারের লেখা গান শুনতে পেয়েছি। একজন দক্ষ পরিচালক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। 'বশেরা' একমাত্র ছবি এখনও পর্যন্ত, যেখানে স্বামী গান লিখেছেন আর স্ত্রী রাখী গুলজার সেই গানে ঠোঁট মিলিয়েছেন। ১৯৮২ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবির সেই গানটা হল 'সবেরা যাহা পে হো / বশেরা ওহী হ্যায়।' সব গানগুলিই হিন্দিতে পেয়েছি। এরপর তিনি বাংলা গানেতে নিজের দক্ষতা দেখিয়েছেন। সুজিত গুহ পরিচালিত আনন্দ নিকেতন ছবিতে। ২০ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে মুক্তি পেয়েছিল ছবিটা। সঞ্জয় ও সুপর্ণা এই ছবির নায়ক-নায়িকা ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন--১) 'ঘুম থেকে উঠলে যে'--গানটি কণ্ঠদান করেছিলেন অমিত কুমার। ২) চলে যাবে সময়, এইগানে অমিতকুমার ও আশা ভোঁসলে একসাথে গেয়েছিলেন। সুরের দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত পঞ্চমদা।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়